এক

তাদের বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় দশ-এগার বছর। সংসারে কোন অভাব নেই। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাই আছে। মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে সমাজের উঁচু তলার চূঁড়া ছুই ছুই করছে। মান সম্মান প্রতিপত্তি যা যেখানে প্রয়োজন সেখানে তা আছে। সব কিছু থেকেও তবু মুনীর চৌধুরী আর তার পত্নী রেবেকা চৌধুরীর মন-প্রাণ অশান্তিতে ছেয়ে আছে সারাক্ষণ। তারা নিঃসন্তান। এই আওলিয়া দরবেশের পুণ্য ভূমিতে জন্মেছেন তাই উপর তলার সিঁড়ি মাড়ালেও ধর্মের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস। কত তদবির তাগাদা করলেন, ডাক্তার কবিরাজও বাদ দেননি। অনেক সাধ্য সাধনার পরেও যখন একটা ছেলে-মেয়ের মুখ দেখতে পারলেন না, তখন চৌধুরী দম্পতি মনে করলেন কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা যে প্রাচুর্যের মালিক হয়েছেন তার মূল্য সমাজের কাছে থাকলেও তাদের নিজেদের কাছে কানা কড়িও নেই।

মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম। এগার ভাইবোনের মধ্যে মাত্র তারা দু'ভাই বোন বেঁচে আছে। মা বাবার আদরের সন্তান, ননীর পুতুল, দু'চোখের মণি, কলিজার টুকরা। স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শৈশব কৈশর তারুণ্য পার করেছেন। লেখা পড়া শিখেছেন মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। অনেক সন্তানের মধ্যে মাত্র দু'টি বেঁচে আছে তাই বেশী লেখা পড়া শিখিয়ে চোখের আড়াল করতে চাননি তাদের বাবা, মা। সখ করে ছেলে বিয়ে দিয়েছিলেন, নাতি পুতির মুখ দেখবেন বলে। তাদের নিয়ে আনন্দ করবেন। কল্পনার কত জাল বুনতেন মুখলেস চৌধুরী। তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণ হল না। অনেকবার মনে করেছেন ছেলেকে পুনরায় বিয়ে দিয়ে আর একটা বউ নিয়ে আসবেন। ছেলে-মেয়ে হোক, সংসারে হাসি আনন্দে, আমোদ আহলাদে ছেয়ে যাক। কিন্তু তিনি কোনদিন সে কথা ছেলে বউয়ের সাথে মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেননি। বউয়ের মূখের দিকে চেয়ে সব ভুলে গেছেন। তিনিই তো দেখে শুনে উচ্চবংশের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে পুত্র বধু হিসাবে নিয়ে এসেছেন। আজ আবার কোন মুখ নিয়ে তিনি ছেলের দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলবেন। শেষে মনে সান্ত না দেন তাদের তো এগারটা ছেলে-মেয়ে হয়েছিল। সবই তো গেল, থাকলো দু'টি। আল্লাহ পাক সুদিন দিলে এই বৌয়ের পেটেই ছেলে হবে। আশার আশায় গেল ছয় বছর। চৌধুরী গিন্নী দুনিয়া ছাড়লেন। এর দেড় বছর পরে চৌধুরী সাহেবও স্ত্রীর পথ ধরলেন। এবার মুনীর দম্পত্তি জগত সংসারকে শূন্য মনে

করলেন। এতো থেকেও তারা নিজেদেরকে অসহায় মনে করলেন। দিনের বেলায় কাজের মধ্যে ডুবে থেকে কিছু অনুভব করতে না পারলেও রাতের বেলা যখন বিশ্রামের জন্য শয্যায় যান তখনই বোঝেন কত বেদনা বুকে জমাট বেধে আছে। কেউ কারও ব্যথা প্রকাশ করতে পারেন না। স্বামী চান না স্ত্রীর মনে দুঃখ দিতে, স্ত্রীও। কিন্তু উভয়ে উভয়ের মনের গভীর ক্ষতের কথা অনুভব করেন। যখন নিজেদের অজান্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তো কেউ কাউকে ফাঁকি দিতে পারেন না।

একদিন রাতে স্ত্রী দু'হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন, আমি একটা কথা বলব শুন্‌বে?

কি বলবে বল।

তুমি আর একটা বিয়ে কর।

সেই গভীর রজনীতে সব নিস্তব্ধতা ভেঙে মুনীর চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন।

হাসলে যে!

হাসির কথা বললে হাসবো না তো কাঁদবো?

নীরব নিস্তব্ধ রজনী। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। কেবল দু'টি প্রাণের নিশ্বাসের শব্দ অন্ধকার ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কোন কথা বলতে না শুনে স্বামী মনে করলেন স্ত্রী হয়ত মনে ব্যথা পেয়েছেন। দু'হাতে তাকে কাছে টেনে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রাগ করলে?

না।

তবে আর কথা বলছো না যে!

বললাম তো! কিন্তু তুমি যে আমার কথার উত্তর না দিয়ে হেসে উড়িয়ে দিলে?

এমন হাসির কথা শুনলে কেনা হাসে, বল?

তোমার যতসব ফাজলমি।

তা কেন, তুমি বিয়ে দিবে, নতুন বউ পাব এতো আনন্দের কথা?

আমি কিন্তু মেয়ে ঠিক করছি। তোমার কোন আপত্তি শুনব না। মা, বাবা আশায় আশায় চলে গেলেন। আমরাও আশায় আশায় শেষ হয়ে যাব। চৌধুরী বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। লোকে বলবে হাটকুড়ির বংশ।

মুনীর চৌধুরী স্ত্রীর মুখ চেপে ধরে বললেন ছি! অমন অলুক্ষণে কথা বলতে নেই। এইতো ভাল আছি।

ভাল না ছাই! আমি অক্ষম। তোমাকে ছেলে মেয়ে উপহার দিতে পারলাম না। আমার জন্য বংশধারা বজায় থাকবে না। একদিন এ বংশের স্বর্গীয় গুরুজনদের অভিশাপ আমাকেই বহন করতে হবে। কবরে যেয়েও শান্তি পাব না।

মুনীর চৌধুরী স্ত্রীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আদর করে বললেন তোমার ধারণা মিথ্যাও তো হতে পারে।

মিথ্যে হবে কেন?

এই ধর ফল ধরার ক্ষমতা তোমার আছে কিন্তু পুষ্ট বীজ দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

ধেৎ! কি অসভ্য তুমি!

তুমি জানো না রেবা! সন্তান না হওয়ার জন্যে মানুষের মনে যে ধারণা জন্মে গেছে সেটা ভুল। এই বিজ্ঞানের যুগে এমন উদ্ভুট কথা বললে ধোপে টিকে না।

এক বার পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি?

পরীক্ষার বিষয়টা বড় কঠিন রেবা। পাশ না করে ফেলও তো করতে পারি। এমন অনিশ্চিত বিষয়ের দিকে পা না দেয়া ভাল। কত ভালবাসি আমরা একে অপর, কেন এর মধ্যে ঘুন ধরাতে যাব। আমরা চেষ্টার ক্রটি করিনি, আরও চেষ্টা করে যাব জীবনাবধি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোন বয়সে সন্তান দিতে পারেন। তার অপার করুণার কোন শেষ নেই। তুমি ভেবনা। সুখ দুঃখ নিয়েই থাকি। মুনীর চৌধুরী স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলের দাবী উপেক্ষা করে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন দ্বিতীয় বিয়ে করবেন না। রেবেকাও শেষ পর্যন্ত স্বামীর অনমনীয় মনোভাব দেখে হাল ছেড়ে দিলেন।

সুরাইয়া বেগম মুনীর চৌধুরীর বড় বোন। তিন ছেলে দুই মেয়ের মা। অকালেই স্বামী হারিয়ে বিধবা হয়েছেন তখন তার ছোট ছেলের বয়স তিন বছর। মেয়ে দু'টি বড়। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি স্বামীর সংসারে বেশ সুখেই আছেন। বড় ছেলে দু'টি স্কুলে পড়ে। ছেলের চাচাই এখন সংসারের কর্তা। অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্ত। তাই সুরাইয়া বেগমকে ছেলে মেয়ের জন্যে কোন বাড়তি চিন্তা করতে হয় না। তার দেবর জামাল অসম্ভব ভালো মানুষ। বড় ভাই তাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন। তারপর ভাবীও তাকে অত্যধিক স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলেছেন, যা শত প্রতিকুলতার মধ্যেও ভুলার নয়। ভাই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। ভাইপো ভাইঝিদের পিতার অভাব বুঝতে দেননি। তাদের আপন সন্তানের মত লালন পালন করছেন।

মুনীর চৌধুরী স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে বিধবা বোনের ছোটছেলে আমির আলীকে দত্তক